Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সমকালীন বিশ্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আব্দুর রহিম

রোলঃ 23100110437

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সমকালীন বিশ্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আব্দুর রহিম

রোলঃ 23100110437

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সমকালীন বিশ্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আব্দুর রহিম, আইডিঃ 23100110437 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সমকালীন বিশ্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

আব্দুর রহিম

আইডিঃ 23100110437

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

১. ভূমিকা.....5

২. জিহাদের সংজ্ঞা.....6

৩. কুরআনে জিহাদ.....6

৪. হাদিসে জিহাদ.....9

৫. জিহাদের প্রকারভেদ.....12

৬. সশস্ত্র জিহাদের শর্ত ও নীতিমালা.....23

৭. জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা.....26

৮. আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদ.....29

৯. উপসংহার.....31

১০. রেফারেন্স.....31

১. ভূমিকা

বর্তমান বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি এবং ধর্মীয় আলোচনায় ‘জিহাদ’ শব্দটি অন্যতম বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত একটি বিষয়। আরবি ‘জিহাদ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো লক্ষ্য অর্জনে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো, পরিশ্রম করা বা সংগ্রাম করা। ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি একজন বিশ্বাসীকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সদা তৎপর রাখে।

দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান বিশ্বে জিহাদ শব্দটিকে একটি নেতিবাচক মোড়কে উপস্থাপন করা হচ্ছে। একদিকে ইসলামভীতি বা ‘ইসলামোফোবিয়া’র কারণে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম ও গবেষকদের একাংশ জিহাদকে কেবল "পবিত্র যুদ্ধ" (Holy War) বা সহিংসতার সমার্থক হিসেবে দেখায়। অন্যদিকে, কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠী নিজস্ব রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে এর ভুল ব্যাখ্যা করে। ফলে সমকালীন বিশ্বে জিহাদ সম্পর্কে এক বিরাট ভুল ধারণা ও সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। তাই ইসলামের সঠিক উৎস থেকে এর প্রকৃত রূপ জানা আজ সময়ের দাবি।

২. জিহাদের সংজ্ঞা

জিহাদের সঠিক মর্মার্থ বুঝতে হলে এর আভিধানিক ও শরয়ী বা পারিভাষিক সংজ্ঞা জানা আবশ্যক।

- **ভাষাগত অর্থ:** আরবি 'জুহদ' (Juhd) বা 'জাহদ' (Jahd) মূলধাতু থেকে জিহাদ শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ হলো— ক্লান্তি, কষ্ট, সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা, কোনো কঠিন কাজে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি বা সক্ষমতা উজাড় করে দেওয়া।
- **শরীয়তের পরিভাষায়:** ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য, অন্যায় ও জুলুমের অবসান ঘটিয়ে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জান, মাল, কলম বা বক্তৃতার মাধ্যমে নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাই হলো জিহাদ। এটি কেবল যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে সমাজ সংস্কারের সামগ্রিক সংগ্রাম এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. কুরআনে জিহাদ

পবিত্র কুরআনে 'জিহাদ' এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত 'কিতাল' (যুদ্ধ) শব্দ দুটি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের আয়াতগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জিহাদ কেবল একটি শারীরিক যুদ্ধ নয়, বরং এটি একটি সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক জীবনসংগ্রাম।

কুরআনে বর্ণিত জিহাদের মূল দিকগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. মক্কী ও মাদানী জীবনের প্রেক্ষাপট

কুরআনে জিহাদের বিধানটি ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়তি জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করে কুরআনের নির্দেশনা বোঝা যায়:

- **মক্কী জীবন (ধৈর্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম):** মক্কায় মুসলমানরা সংখ্যায় কম এবং নির্যাতিত ছিলেন। এই ১৩ বছর মুসলমানদের সশস্ত্র প্রতিরোধের অনুমতি ছিল না। তখন জিহাদ বলতে ছিল ঈমানের ওপর অবিচল থাকা, ধৈর্য ধারণ করা এবং কুরআনের জ্ঞান দিয়ে মানুষকে বোঝানো।

- **মাদানী জীবন (রাষ্ট্রীয় ও সশস্ত্র প্রতিরোধ):** মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর যখন কাফেররা মুসলমানদের অস্তিত্ব ও ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার জন্য বারবার আক্রমণ করতে আসে, তখন আত্মরক্ষা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সশস্ত্র জিহাদ বা 'কিতাল'-এর অনুমতি দেওয়া হয়।

২. কুরআনে বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রচারণামূলক জিহাদ

অস্ত্র বা যুদ্ধ ছাড়াই যে বড় জিহাদ করা সম্ভব, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মক্কী যুগের এই আয়াতটি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"কাজেই আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে এক মহা জিহাদ (জিহাদান কাবিরা) চালিয়ে যান।" — (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫২)

এখানে 'কুরআনের সাহায্যে জিহাদ' বলতে ইসলামের সত্যবাণী, যুক্তি, জ্ঞান এবং লেখনীর মাধ্যমে কুসংস্কার ও মিথ্যার মোকাবেলা করাকে বোঝানো হয়েছে।

৩. জান ও মাল দিয়ে জিহাদের নির্দেশ

কুরআনে বারবার মুমিনদের তাদের জীবন (জান) এবং সম্পদ (মাল) আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে সংগ্রাম করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। একেই প্রকৃত সফলতার মাপকাঠি বলা হয়েছে:

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা অত্যন্ত বড় এবং তারাই সফলকাম।" — (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়েও লাভজনক এক সওদার কথা বলেছেন, যা মানুষকে কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করবে:

"তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।" — (সূরা আস-সফ, আয়াত: ১১)

৪. সশস্ত্র জিহাদ বা 'কিতাল'-এর উদ্দেশ্য

কুরআনে যখনই সশস্ত্র যুদ্ধের (কিতাল) আদেশ দেওয়া হয়েছে, তার পেছনে সুনির্দিষ্ট মানবিক ও সামাজিক কারণ ছিল। ইসলামে যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো:

ক. আত্মরক্ষা এবং আগ্রাসন প্রতিরোধ

মুসলমানরা যুদ্ধ শুরু করেনি, বরং তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম যখন যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়, তখন কুরআন বলেছিল:

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো হচ্ছে তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।" — (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩৯)

খ. ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা

ইসলামে যুদ্ধ কেবল মুসলমানদের রক্ষার জন্য নয়, বরং সব ধর্মের মানুষের উপাসনালয় ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছিল। কুরআন স্পষ্ট করে:

"আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিস্টানদের) মঠ, গির্জা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ—যাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়—তা ধ্বংস হয়ে যেত।" — (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৪০)

গ. মজলুম ও দুর্বলদের উদ্ধার

পৃথিবীর কোথাও কোনো নিরীহ মানুষ, নারী বা শিশু যদি অত্যাচারিত হয়, তবে তাদের মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করা মুসলমানদের দায়িত্ব। কুরআন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে:

"তোমাদের কী হলো যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং সেইসব দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যুদ্ধ করছ না, যারা বলছে—হে আমাদের প্রতিপালক! এই অত্যাচারী জনপদ থেকে আমাদের মুক্ত করুন..." — (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭৫)

৫. সীমালঙ্ঘন ও জবরদস্তির নিষেধাজ্ঞা

কুরআন যুদ্ধের অনুমতি দিলেও তা যেন কোনোভাবেই সন্ত্রাস বা উগ্রবাদে রূপ না নেয়, সেজন্য কঠোর সীমারেখা টেনে দিয়েছে:

- **আগে আক্রমণ না করা:** *"আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তবে সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"* — (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯০)
- **শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ:** শত্রু পক্ষ যদি যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি চায়, তবে মুসলমানদেরও যুদ্ধ থামানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: *"আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও শান্তির দিকে ঝুঁকুন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন।"* — (সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬১)

- **জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন না করানো:** যুদ্ধের উদ্দেশ্য মানুষকে জোর করে মুসলিম বানানো নয়। কারণ কুরআন বলে: *"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই।"* — (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬)

সারসংক্ষেপ

কুরআনের দৃষ্টিতে জিহাদ হলো—ব্যক্তিগত জীবনে পাপ ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা, সামাজিকভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে জুলুম, অন্যায় ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো। এটি কোনো ধ্বংসাত্মক তলোয়ারের খেলা নয়, বরং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক পবিত্র ঐশী পদ্ধতি।

৪. হাদিসে জিহাদ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ ও হাদিস গ্রন্থে জিহাদের ব্যাপক পরিধি স্পষ্ট করা হয়েছে। একটি বিখ্যাত বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক যুদ্ধ থেকে ফিরে সাহাবিদের বলেছিলেন, *"আমরা ছোট জিহাদ (যুদ্ধ) থেকে বড় জিহাদের (আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম) দিকে ফিরে এলাম।"*(বায়হাকি)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে জিহাদে অংশ নেওয়ার অনুমতি চাইলেন। নবীজী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, *"তোমার পিতামাতা কি জীবিত?"* সে বলল, "হ্যাঁ।" নবীজী বললেন, *"তবে তাদের সেবা করার মাধ্যমেই তুমি জিহাদ করো।"* (সহীহ বুখারী)। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে জিহাদের ধারণা কতটা মানবিক ও বিস্তৃত।

হাদিস শাস্ত্রে 'জিহাদ' অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি প্রধান হাদিস গ্রন্থে (যেমন: বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি) **"কিতাবুল জিহাদ"** বা 'জিহাদ অধ্যায়' নামে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ও কর্মের (হাদিস) মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, জিহাদ কেবল তরবারি বা যুদ্ধের ময়দানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর পরিধি মানুষের পুরো জীবনকে ঘিরে বিস্তৃত। হাদিসের আলোকেই জিহাদের বিভিন্ন রূপ ও এর কঠোর নীতিমালা সুনির্দিষ্ট হয়েছে।

নিচে হাদিসের আলোকে জিহাদের মূল দিকগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. শ্রেষ্ঠ জিহাদ: আত্মশুদ্ধি বা নফসের বিরুদ্ধে লড়াই

নবী করীম (সা.) মানুষের ভেতরের কুপ্রবৃত্তি ও পাপের ইচ্ছাকে দমন করাকে সবচেয়ে বড় সংগ্রাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একটি বিখ্যাত হাদিসে এসেছে:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"প্রকৃত মুজাহিদ (জিহাদকারী) সে-ই, যে আল্লাহর আনুগত্যের স্বার্থে নিজের নফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে।"* — (সুনান তিরমিযী)

২. পিতামাতার সেবা করাও জিহাদ

পারিবারিক দায়িত্ব পালন ও পিতামাতার সেবা করাকে ইসলামে সশস্ত্র জিহাদের চেয়েও বেশি বা সমপর্যায়ের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। নবীজী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, *"তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন?"* সে বলল, "হ্যাঁ।" তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, *"তাহলে তাদের সেবার মাধ্যমেই তুমি জিহাদ করো।"* — (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৩. জ্ঞান ও কলমের মাধ্যমে জিহাদ

ইসলামের সত্য বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং কাফের বা বিরোধীদের কুৎসার জবাব বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দিয়ে দেওয়াও জিহাদের অংশ।

নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন, *"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল, জান এবং জবান (মুখ/কলম) দ্বারা জিহাদ করো।"* — (সুনান আবু দাউদ)

৪. অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য বলা শ্রেষ্ঠ জিহাদ

সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলাকে রাসুল (সা.) অন্যতম শ্রেষ্ঠ জিহাদ বলে ঘোষণা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলাই হলো সর্বোত্তম জিহাদ।"* — (সুনান আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৫. হজ্জ: নারীদের জন্য উত্তম জিহাদ

শারীরিক সক্ষমতা ও পারিপার্শ্বিক কারণে নারীদের জন্য সাধারণত সশস্ত্র যুদ্ধ বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে তাদের জন্যও জিহাদের সওয়াব পাওয়ার পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনাদের সাথে জিহাদে শরিক হব না?" নবীজী উত্তর দিলেন, *"তোমাদের (নারীদের) জন্য সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে সুন্দর জিহাদ হলো 'হজ্জে মাবরুর' (মকবুল হজ্জ)।"* — (সহীহ বুখারী)

৬. যুদ্ধের ময়দানে (সশস্ত্র জিহাদে) হাদিসের কঠোর মানবিক নীতিমালা

হাদিস শরীফে যুদ্ধের ময়দানেও চরম মানবিকতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখনই কোনো বাহিনীকে অভিযানে পাঠাতেন, তখন কঠোর কিছু নিয়ম বেঁধে দিতেন:

- **নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ:** হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক যুদ্ধে একটি নারীর মরদেহ পাওয়া যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। — (সহীহ বুখারী)
- **বৃদ্ধ ও সন্ন্যাসীদের নিরাপত্তা:** *"তোমরা কোনো বৃদ্ধ, শিশু, নারী এবং উপাসনালয়ে অবস্থানরত উপাসকদের (পুরোহিত/সন্ন্যাসী) হত্যা করবে না।"* — (বায়হাকি)
- **পরিবেশ ও সম্পদের ক্ষতি না করা:** রাসুল (সা.) ও পরবর্তীতে খলীফাগণ নির্দেশ দিতেন যেন শত্রুপক্ষের ফলবান গাছপালা কাটা না হয়, ফসল পুড়িয়ে দেওয়া না হয় এবং গবাদিপশু (খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া) জবাই করা না হয়।
- **বিশ্বাসঘাতকতা না করা:** *"তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করো না, চুক্তির খেলাপ করো না এবং নিহত শত্রুর মরদেহ বিকৃত (নাক-কান কাটা) করো না।"* — (সহীহ মুসলিম)

সারসংক্ষেপ

হাদিস শাস্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৃষ্টিতে জিহাদ হলো সমাজ ও মানুষের কল্যাণ সাধনের একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। একজন মুমিন তার নিজের ভেতরের পাপের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে, পিতামাতার যে সেবা করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সত্য কথা বলে—তার প্রতিটিই হাদিসের পরিভাষায় একেকটি ‘জিহাদ’। আর সশস্ত্র যুদ্ধ কেবল তখনই বৈধ, যখন তা মজলুমের অধিকার রক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

৫. জিহাদের প্রকারভেদ

ইসলামী ফিকহ ও পণ্ডিতদের মতে, জিহাদ প্রধানত চার প্রকার:

১. **নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ (আত্মসংযম):** নিজের কুপ্রবৃত্তি, লোভ, অহংকার ও পাপাচারের ইচ্ছা দমন করে আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত থাকার যে সংগ্রাম, তাকে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ বলা হয়। এটিই ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে কঠিন ও শ্রেষ্ঠ জিহাদ।

ইসলামী পরিভাষায় নিজের নফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামকে **'জিহাদ আন-নফস'** (Jihad an-Nafs) বা আত্মসংযমের জিহাদ বলা হয়। এটিই হলো ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে মৌলিক ও অভ্যন্তরীণ জিহাদ, যা ছাড়া একজন মানুষ প্রকৃত মুমিন হতে পারে না।

কুরআন, হাদিস এবং সুফি গবেষকদের আলোচনার আলোকে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের বিস্তারিত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. ইসলামের দৃষ্টিতে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের গুরুত্ব

ইসলামে মানুষের বাহ্যিক আচরণের চেয়ে ভেতরের পবিত্রতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ মানুষের মন বা নফস যদি কলুষিত থাকে, তবে তার দ্বারা সমাজ সংস্কার বা অন্য কোনো কল্যাণকর কাজ সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই জিহাদকে জীবনের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম বা **'জিহাদে আকবর'** হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একটি হাদিসে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন:

"প্রকৃত মুজাহিদ (জিহাদকারী) সে-ই, যে আল্লাহর আনুগত্যের স্বার্থে নিজের নফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে।" — (সুনান তিরমিযী)

ইসলামী পণ্ডিতদের মতে, শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে নিজের নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বেশি কঠিন। কারণ বাইরের শত্রু কখনো সামনে আসে, কখনো দূরে থাকে; কিন্তু 'নফস' নামক শত্রুটি মানুষের নিজের ভেতরে ২৪ ঘণ্টা অবস্থান করে এবং প্রতিনিয়ত মন্দ কাজের প্ররোচনা দেয়।

২. কুরআনে বর্ণিত নফসের তিনটি স্তর

পবিত্র কুরআনে মানুষের মন বা আত্মিক অবস্থাকে **'নফস'** (Nafs) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ ও নৈতিক চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে কুরআন মানুষের নফসের তিনটি প্রধান স্তর বা অবস্থার বর্ণনা দিয়েছে।

নফসের এই তিনটি স্তর মানুষের ভালো ও মন্দ কাজের ভেতরের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। নিচে কুরআনের আলোকে এই তিনটি স্তর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. নফসে আম্মারা (النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ) — মন্দপ্রবণ আত্মা

এটি মানুষের নফসের সবচেয়ে প্রাথমিক এবং নিম্নতম স্তর। এই স্তরের নফস মানুষকে সর্বদা পাপ কাজ, অন্যায়, লোভ, অহংকার এবং কুপ্রবৃত্তির দিকে ধাবিত করে। এই অবস্থায় মানুষের বিবেক ও বুদ্ধি তার পশুবৃত্তির কাছে হেরে যায়।

- **কুরআনের দলিল:** সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জবানিতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

  "আর আমি আমার নফসকে নির্দোষ মনে করি না, নিশ্চয়ই মানুষের নফস মন্দ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে (আম্মারা)।" — (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৩)
- **বৈশিষ্ট্য:** এই স্তরে থাকা মানুষ পাপ করতে কোনো দ্বিধাবোধ করে না এবং আল্লাহর অবাধ্য হওয়াকে নিজের স্বাধীনতা মনে করে। একে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই 'নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ' শুরু করতে হয়।

২. নফসে লাউওয়ামা (النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ) — অনুতপ্ত বা বিবেকবান আত্মা

এটি নফসের দ্বিতীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর। এই স্তরে মানুষের বিবেক জাগ্রত থাকে। মানুষ যখন কোনো ভুল বা পাপ কাজ করে ফেলে, তখন তার ভেতরের আত্মা বা বিবেক তাকে দংশন করে, সে অনুতপ্ত হয় এবং নিজেকে ধিক্কার দেয়।

- **কুরআনের দলিল:** আল্লাহ তাআলা এই নফসের কসম খেয়ে কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

  "আমি কসম খাচ্ছি কিয়ামত দিবসের এবং কসম খাচ্ছি সেই নফসের, যা নিজেকে ধিক্কার দেয় (লাউওয়ামা)।" — (সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ১-২)
- **বৈশিষ্ট্য:** এই স্তরের মানুষ পুরোপুরি নিষ্পাপ নয়, তবে সে পাপের ওপর অবিচল থাকে না। ভুল হলেই সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় (তাওবা করে) এবং নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করে। একজন মুমিনের জীবনে এই স্তরটি একটি বড় আধ্যাত্মিক যুদ্ধক্ষেত্র।

৩. নফসে মুতমাইন্নাহ (النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) — প্রশান্ত আত্মা

এটি নফসের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত স্তর। দীর্ঘ সাধনা, ইবাদত এবং আত্মসংযমের মাধ্যমে যখন মানুষ নিজের কুপ্রবৃত্তিকে পুরোপুরি জয় করে নেয়, তখন তার নফস এই স্তরে

পৌঁছায়। এই অবস্থায় মানুষ আল্লাহর বিধানের ওপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকে এবং নেক কাজ করার মাঝেই পরম শান্তি খুঁজে পায়।

- **কুরআনের দলিল:** মৃত্যুর সময় এবং কিয়ামতের দিন এই সৌভাগ্যবান আত্মাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বলবেন: *"হে প্রশান্ত আত্মা (মুতমাইন্নাহ)! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার (নেককার) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।"* — (সূরা আল-ফাজর, আয়াত: ২৭-৩০)
- **বৈশিষ্ট্য:** এই স্তরে পৌঁছালে মানুষের মন থেকে দুনিয়ার মোহ, হিংসা, ভয় ও হতাশা দূর হয়ে যায়। শয়তান বা কুপ্রবৃত্তি তাকে আর আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।

সারসংক্ষেপ

ইসলামে আত্মশুদ্ধি বা تزكية النفس (তাযকিয়াতুন নাফস)-এর মূল লক্ষ্যই হলো মানুষকে **'নফসে আম্মারা'** (মন্দপ্রবণতা) থেকে মুক্ত করে, **'নফসে লাউওয়ামা'** (অনুতাপ ও সংশোধন)-এর মধ্য দিয়ে **'নফসে মুতমাইন্নাহ'** বা চিরপ্রশান্ত আত্মার স্তরে উন্নীত করা।

৩. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করার উপায় (আত্মসংযমের কৌশল)

নিজের ভেতরের কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইসলাম কিছু বাস্তবসম্মত ও আধ্যাত্মিক উপায় বাতলে দিয়েছে:

- **নিয়মিত ইবাদত ও যিকির:** সালাত (নামাজ) মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকির বা স্মরণ অন্তরের কালিমা দূর করে।
- **রমজানের রোজা (সিয়াম):** রোজা হলো আত্মসংযমের সবচেয়ে বড় বার্ষিক প্রশিক্ষণ। এটি মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং কামনাবাসনাকে আল্লাহর আদেশে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়।
- **হালাল-হারামের কঠোর প্রাচীর:** চোখ, কান, জবান এবং অন্তরকে সব ধরনের হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় (যেমন: মিথ্যা, গীবত, পরনিন্দা, সুদ, ঘুষ, অশ্লীলতা) থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

- **মুহাসাবাহ বা আত্মপর্যালোচনা:** প্রতিদিন ঘুমানোর আগে নিজের সারাদিনের কাজের হিসাব নেওয়া—আজকে ভালো কাজ কী করলাম আর পাপ কী করলাম। পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং পরদিন তা না করার সংকল্প করা।
- **সৎসঙ্গ ও নেককারদের সাহচর্য:** ভালো মানুষের সাথে চলাফেরা করলে নফস ভালো কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে, আর মন্দ সঙ্গ নফসকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

৪. সমকালীন বিশ্বে এর প্রাসঙ্গিকতা

আজকের আধুনিক যুগে 'নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ' আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্ব ভোগবাদ, অশ্লীলতা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার, মানসিক অস্থিরতা এবং নৈতিক অবক্ষয়ে জর্জরিত।

এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহ, তীব্র লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ এবং অহংকার থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে একজন সৎ, আদর্শ ও মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হিসেবে টিকে থাকার যে লড়াই—তাই হলো সমকালীন প্রেক্ষাপটে নফসের বিরুদ্ধে প্রকৃত জিহাদ। যে ব্যক্তি নিজের নফসকে জয় করতে পেরেছে, সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই সফল।

২. **শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ:** শয়তানের প্ররোচনা, কুশিক্ষা এবং আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার নানামুখী চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সতর্ক থাকা এবং ঈমানের ওপর অবিচল থাকার সংগ্রাম।

ইসলামী আকীদা ও জীবনব্যবস্থায় **'শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ'** বা শয়তানের নানামুখী চক্রান্তের মোকাবেলা করা মুমিনের জীবনের অন্যতম প্রধান ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা শয়তানকে মানুষের একমাত্র প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাই শয়তানের ধোঁকা ও ফাঁদ থেকে নিজের ঈমান-আমল রক্ষা করার লড়াইকে ইসলামের পরিভাষায় 'শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ' বলা হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর বিশ্লেষণ এবং কুরআন-হাদিসের আলোকে এই জিহাদের বিস্তারিত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মানবজাতিকে সতর্ক করে বলেছেন:

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবেই গণ্য করো। সে তো তার দলবলকে কেবল এজন্যই ডাকে, যাতে তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী হয়।"

— (সূরা ফাতির, আয়াত: ৬)

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শয়তান মানুষের রক্তে ও রগে রগে চলাচল করে (সহীহ বুখারী) এবং মানুষের মনে 'ওয়াসওয়াসা' বা কুমন্ত্রণা দেয়। এই শত্রুর বিরুদ্ধে কোনো শারীরিক অস্ত্র কাজ করে না, এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় আধ্যাত্মিক ও ঈমানী শক্তি দিয়ে।

২. শয়তানের আক্রমণের দুটি প্রধান দিক ও তার প্রতিহতকরণ

ইসলামী পণ্ডিতদের মতে, শয়তান মূলত দুটি প্রধান অস্ত্র ব্যবহার করে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এই দুটির বিরুদ্ধে লড়াই করাই হলো শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ:

ক. শুsubheader (Shubahat) বা 'সংশয় ও বিভ্রান্তি'র বিরুদ্ধে জিহাদ

শয়তান মানুষের মনে আল্লাহর অস্তিত্ব, ইসলামের বিধান, পরকাল এবং দ্বীনের সত্যতা নিয়ে নানা রকম বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক ছদ্মবেশে সংশয় ও কুসংস্কার তৈরি করে।

- **প্রতিরোধের উপায়:** এই জিহাদ জিততে হলে **'ইয়াকীন' বা সুদৃঢ় বিশ্বাস** এবং **ইসলামের সঠিক জ্ঞান** অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই পারে শয়তানের তৈরি করা সব বুদ্ধিবৃত্তিক সংশয়ের দেয়াল ভেঙে দিতে।

খ. শাহওয়াত (Shahawat) বা 'কুপ্রবৃত্তি ও ভোগবিলাস'-এর বিরুদ্ধে জিহাদ

যখন শয়তান কাউকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না, তখন সে তাকে বিভিন্ন পাপের প্রতি আকৃষ্ট করে। যেমন: লোভ, অহংকার, পরনিন্দা, অবৈধ সম্পর্ক, সুদ-ঘুষ এবং দুনিয়ার মোহে অন্ধ করে দেওয়া।

- **প্রতিরোধের উপায়:** এই জিহাদ জিততে প্রয়োজন **'সবর' বা ধৈর্য এবং আত্মসংযম**। পাপের আকর্ষণ সামনে এলেও আল্লাহর ভয়ে নিজেকে ধরে রাখাই হলো এই স্তরের মূল জিহাদ।

৩. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের ঢাল বা রণকৌশল

শয়তানের বিরুদ্ধে এই অদৃশ্য যুদ্ধে জয়ী হতে ইসলাম কিছু শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ঢাল বা হাতিয়ার নির্ধারণ করে দিয়েছে:

- **আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা (ইস্তিয়াজাহ):** শয়তানের কোনো কুপ্ররোচনা মনে এলেই মুখ ও অন্তরে "আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" (বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি) বলা। কুরআন বলে: *"যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো উস্কানি তোমাকে স্পর্শ করে, তবে আল্লাহর আশ্রয় চাও।"* (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ২০০)।

- **ইখলাস বা খাঁটি নিয়ত:** শয়তান স্বয়ং আল্লাহর কাছে স্বীকার করেছে যে, সে আল্লাহর 'মুখলিস' বা নিষ্ঠাবান বান্দাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না (সূরা হিজর, আয়াত: ৪০)। সব কাজে নিয়ত খাঁটি রাখলে শয়তান পরাস্ত হয়।
- **কুরআন তিলাওয়াত ও আয়াতুল কুরসি:** বিশেষ করে সূরা আল-বাকারাহ এবং রাতে ঘুমানোর আগে আয়াতুল কুরসি পাঠ করলে শয়তান সেই মানুষ এবং তার বাড়ি থেকে দূরে থাকে (সহীহ বুখারী)।
- **সতর্কতা ও সচেতনতা:** শয়তান মানুষকে একবারে বড় পাপে লিপ্ত করে না, সে ছোট ছোট পদক্ষেপে (Steps) এগোয়। কুরআন তাই সতর্ক করেছে: *"তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।"* (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৮)। মুমিনের জিহাদ হলো শয়তানের এই প্রাথমিক পদক্ষেপগুলোকেই চিনে তা বর্জন করা।

সারসংক্ষেপ

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ কোনো সাময়িক লড়াই নয়, এটি মানুষের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চলমান এক মহাযুদ্ধ। এই জিহাদের মূল লক্ষ্য হলো শয়তানের দেওয়া ধোঁকা, অলসতা, হতাশা ও কুন্ত্রণাকে পরাস্ত করে নিজের হৃদয়কে আল্লাহর জিকির ও আনুগত্যে সজীব রাখা। যে ব্যক্তি এই যুদ্ধে সচেতন থাকে, আল্লাহ তাকে শয়তানের সব চক্রান্ত থেকে সুরক্ষিত রাখেন।

৩. **দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদ:** ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের কাছে প্রচার করা, লেখনী, বক্তৃতা এবং যুক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে সমকালীন বিভ্রান্তি দূর করা। একে 'জিহাদ বিল ইলম' বা বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ বলা হয়।

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় **'দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদ'**—যাকে আরবিতে **'জিহাদ বিল ইলম ওয়াল বয়ান'** (Jihad bil-Ilm wal-Bayan) বলা হয়—তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও দূরপ্রসারী এক সংগ্রাম। তরবারি বা অস্ত্রের যুদ্ধের চেয়েও ইসলামে জ্ঞান ও প্রচারের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইকে অনেক ক্ষেত্রে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ, অস্ত্র কেবল মানুষের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু জ্ঞান ও দাওয়াহ মানুষের অন্তরকে জয় করে এবং সমাজকে আমূল বদলে দেয়।

নিচে এই বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রচারণামূলক জিহাদের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. কুরআনের আলোতে জ্ঞানের জিহাদ

পবিত্র কুরআনে জ্ঞান এবং প্রচারের মাধ্যমে অসত্যের মোকাবেলা করাকে সরাসরি **"মহা জিহাদ"** বা **"জিহাদান কাবিরা"** হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মক্কী যুগে যখন মুসলমানদের অস্ত্র ধরার কোনো অনুমতি ছিল না, তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন:

"কাজেই আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের সাহায্যে (এর জ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে) তাদের বিরুদ্ধে এক মহা জিহাদ চালিয়ে যান।" — (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫২)

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, কুরআনের অকাট্য যুক্তি, সুমহান দর্শন এবং ঐশী জ্ঞান দিয়ে মানুষের মনের অন্ধকার ও কুসংস্কার দূর করার যে প্রচেষ্টা, তা-ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় জিহাদ।

২. হাদিসের আলোতে দাওয়াহ ও লেখনীর জিহাদ

রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু যুদ্ধের ময়দানেই নয়, বরং সাহাবিদের মেধা ও মননশীলতাকেও দ্বীনের বিজয়ের জন্য ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

- **জবান ও কলমের লড়াই:** আল্লাহর রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন: *"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল, জান এবং জবান (মুখ/কলম) দ্বারা জিহাদ করো।"* — (সুনান আবু দাউদ)
- **কবি ও লেখকদের ভূমিকা:** মক্কার কাফেররা যখন কবিতা ও বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতো, তখন নবীজী (সা.) কবি হাসসান ইবনে সাবিত (রা.)-কে তাদের জবাব দিতে অনুপ্রাণিত করে বলতেন, *"তুমি তোমার কবিতার মাধ্যমে তাদের জবাব দাও, নিশ্চয়ই রুহুল কুদুস (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) তোমার সাথে আছেন।"* — (সহীহ বুখারী)

৩. দাওয়াহ ও জ্ঞানের জিহাদের মূল ক্ষেত্রসমূহ

বর্তমান যুগে এই জিহাদের পরিধি ও কার্যকারিতা ব্যাপক। এর প্রধান ক্ষেত্রগুলো হলো:

ক. ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা (Islamophobia) দূর করা

সমকালীন বিশ্বে মিডিয়া ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামকে উগ্রবাদ ও সহিংসতার ধর্ম হিসেবে চিত্রায়িত করা হচ্ছে। এই বৈশ্বিক প্রচারণার বিপরীতে ইসলামের প্রকৃত রূপ—এর শান্তি, উদারতা, মানবাধিকার এবং বিজ্ঞানমনস্কতা—যুক্তি ও আধুনিক ভাষায় বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা জ্ঞান ও দাওয়াহর অন্যতম প্রধান জিহাদ।

খ. আধুনিক সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার মোকাবেলা

দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যাখ্যা করে তরুণ প্রজন্মের মনে যে নাস্তিক্যবাদ ও সংশয় তৈরি করা হচ্ছে, তার জবাব কেবল অস্ত্র দিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন গভীর জ্ঞান। কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে উপস্থাপন করে তরুণদের ঈমান রক্ষা করা বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ।

গ. সমাজ থেকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূরীকরণ

মুসলিম সমাজের ভেতরেই ঢুকে পড়া নানা রকম বিদ'আত, শিরক, কুসংস্কার এবং নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সঠিক জ্ঞান ও হিকমতের (প্রজ্ঞার) সাথে আজীবন সংগ্রাম করাও এই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

৪. এই জিহাদ পরিচালনার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা

জ্ঞানের মাধ্যমে দাওয়াহ দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম কঠোর কিছু নিয়ম নির্ধারণ করেছে, যা পালন করা প্রত্যেক দাঈ (আহ্বায়ক) বা লেখকের জন্য আবশ্যক:

- **প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ:** *"আপনি আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করুন হিকমত (প্রজ্ঞা) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সুন্দরতম পন্থায়।"* — (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫)
- **নম্রতা ও বিনয়:** দাওয়াহর ভাষা কখনোই উগ্র বা আক্রমণাত্মক হবে না। আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের মতো অত্যাচারী শাসকের কাছে মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে পাঠানোর সময়ও নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা তার সাথে "নরম ভাষায়" কথা বলেন (সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৪৪)।

সারসংক্ষেপ

আজকের একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ‘দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদ’ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ও শক্তিশালী। বন্দুক বা বোমার চেয়ে ইন্টারনেটের একটি তথ্যবহুল লেখা, একটি যুক্তিপূর্ণ ভিডিও বা একটি সুন্দর বই মানুষের চিন্তাধারাকে বেশি প্রভাবিত করতে পারে। যারা নিজেদের মেধা, লেখনী, বক্তৃতা এবং সুন্দর আচরণের মাধ্যমে দ্বীনের আলো ছড়াচ্ছেন, তারা সবাই ইসলামের দৃষ্টিতে এই মহামূল্যবান বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদে লিপ্ত রয়েছেন।

৪. **সশস্ত্র কিতাল বা জিহাদ (শর্তসাপেক্ষ):** রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, কোনো জনপদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া আগ্রাসন প্রতিরোধ এবং মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা (ধর্মীয় স্বাধীনতা)

রক্ষার জন্য প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করা। তবে এটি সম্পূর্ণ শর্তসাপেক্ষ এবং সাধারণ পরিস্থিতিতে এককভাবে করার সুযোগ নেই।

ইসলামী শরীয়তে **'সশস্ত্র জিহাদ'** বা পরিভাষায় যাকে **'কিতাল' (قتال - যুদ্ধ)** বলা হয়, তা ইসলামের একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল, সুশৃঙ্খল এবং সম্পূর্ণ শর্তসাপেক্ষ বিষয়। সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজের ইচ্ছামতো অস্ত্র তুলে নেওয়ার বা সহিংসতা ছড়ানোর কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। এটি কেবল চরম পরিস্থিতিতে— রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আত্মরক্ষা এবং মজলুমের অধিকার রক্ষার জন্য আইনগতভাবে পরিচালিত একটি ব্যবস্থা।

নিচে সশস্ত্র কিতাল বা জিহাদের শর্ত, নীতিমালা ও এর মূল লক্ষ্য বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. সশস্ত্র কিতাল বা জিহাদের মূল উদ্দেশ্য

ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য কখনোই সাম্রাজ্য বিস্তার, সম্পদ লুণ্ঠন, কোনো জাতিকে গোলাম বানানো বা জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানো নয়। কুরআনের আলোতে সশস্ত্র জিহাদের মূল উদ্দেশ্য তিনটি:

- **আত্মরক্ষা ও আগ্রাসন প্রতিরোধ:** যখন মুসলমানদের অস্তিত্ব, ভূমি ও অধিকারের ওপর শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে, তখন তা প্রতিহত করা। *"আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে সীমালঙ্ঘন করো না।"* — (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯০)
- **ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা:** কেবল মুসলমানদের মসজিদ নয়, বরং পৃথিবীতে খ্রিস্টানদের গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয়সহ সব মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৪০)।
- **মজলুম ও অত্যাচারিতদের উদ্ধার:** বিশ্বের কোনো জনপদে যখন অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুরা জালিমের নির্যাতনে আর্তনাদ করে, তখন তাদের উদ্ধার করা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭৫)।

২. সশস্ত্র জিহাদ বা কিতাল বৈধ হওয়ার প্রধান শর্তসমূহ

ইসলামী ফিকহ (আইনশাস্ত্র) অনুযায়ী, একটি যুদ্ধকে 'জিহাদ' হিসেবে গণ্য হতে হলে নিচের শর্তগুলো পূরণ হওয়া বাধ্যতামূলক:

- **বৈধ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ (Imam/State Authority):** সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণার একক অধিকার রয়েছে কেবল একটি স্বীকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বা আমিরের। কোনো উগ্রপন্থী দল, গোষ্ঠী বা সাধারণ নাগরিক নিজেরা আইন হাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধ বা কিতাল ঘোষণা করতে পারে না। এমনটি করলে তা জিহাদ নয়, বরং 'ফিতনাহ' (বিশৃঙ্খলা) বা 'ইরজাফ' (সন্ত্রাসবাদ) হিসেবে গণ্য হবে।
- **সক্ষমতা ও শক্তি (Capability):** মুসলমানদের জানমাল রক্ষার মতো পর্যাপ্ত সামরিক ও কৌশলগত শক্তি থাকতে হবে। যদি শক্তি না থাকে, তবে আত্মঘাতী বা হঠকারী কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যাবে না।
- **চুক্তি বা শান্তিচুক্তির অনুপস্থিতি:** যদি অন্য কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র বা জাতির সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের অনাগ্রাসন বা শান্তিচুক্তি (Peace Treaty) থাকে, তবে কোনো অবস্থাতেই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা যাবে না। ইসলামে চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করা বাধ্যতামূলক।
- **উত্তম নিয়ত (খাঁটি উদ্দেশ্য):** যুদ্ধ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই হতে হবে। ব্যক্তিগত বীরত্ব প্রদর্শন, প্রতিশোধ গ্রহণ বা গোত্রীয় অহংকার প্রকাশের জন্য যুদ্ধ করলে তা জিহাদ হবে না (সহীহ বুখারী)।

৩. যুদ্ধকালীন মানবিক নীতিমালা (Rules of Engagement)

যুদ্ধের ময়দানেও ইসলাম মানুষের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের স্পষ্ট নির্দেশাবলি দ্বারা গঠিত এই আন্তর্জাতিক যুদ্ধ নীতি আধুনিক বিশ্বকেও তাক লাগিয়ে দেয়:

- **বেসামরিক মানুষ (Civilian) হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ:** যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়নি এমন কোনো মানুষকে আঘাত করা যাবে না।
- **নারী, শিশু ও বৃদ্ধের নিরাপত্তা:** যুদ্ধের ময়দানে কোনো নারী, শিশু এবং অতি বৃদ্ধ মানুষকে হত্যা করা যাবে না, তা তারা শত্রুপক্ষের হলেও।
- **ধর্মীয় উপাসকদের সুরক্ষা:** গির্জা, মন্দির বা মঠে যারা যার যার ধর্মে মগ্ন থাকে (যেমন: পুরোহিত, সন্ন্যাসী), তাদের গায়ে হাত তোলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- **পরিবেশ ও সম্পদের ক্ষতি না করা:** ফলবান গাছ কাটা, শস্যক্ষেত পুড়িয়ে দেওয়া, জনবসতি ধ্বংস করা এবং খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গবাদিপশু হত্যা করা যাবে না।

- **মরদেহের অবমাননা নিষিদ্ধ:** নিহত শত্রুর লাশ বিকৃত (নাক-কান কাটা বা পুড়িয়ে ফেলা) করা যাবে না।
- **শান্তির প্রস্তাব এলে যুদ্ধ বিরতি:** শত্রু পক্ষ যদি যুদ্ধের যেকোনো পর্যায়ে যুদ্ধ থামিয়ে শান্তির প্রস্তাব দেয় বা সন্ধি করতে চায়, তবে মুসলমানদেরও যুদ্ধ থামানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬১)।

সারসংক্ষেপ

ইসলামের 'সশস্ত্র কিতাল' কোনো বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্যবাদী ব্যবস্থা নয়, বরং এটি একটি সুসংগঠিত 'ডিফেন্স মেকানিজম' বা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। আধুনিক পরিভাষায় একটি স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনী যেভাবে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা বা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের হয়ে কাজ করে, ইসলামের কিতাল বা সশস্ত্র জিহাদের রূপটি তেমনই রাষ্ট্রীয় ও আইনানুগ। কোনো ব্যক্তি বা উগ্রপন্থী দলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ইসলামের এই পবিত্র বিধানের সাথে মেলানোর কোনো সুযোগ নেই।

৬. সশস্ত্র জিহাদের শর্ত ও নীতিমালা

ইসলামী শরীয়তে যুদ্ধ বা সশস্ত্র জিহাদের বিষয়টি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং কঠোর নিয়ম-নীতি দ্বারা আবৃত। ইসলামে যুদ্ধ কোনো রক্তপাত বা বিশৃঙ্খলা তৈরির মাধ্যম নয়, বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো জুলুমের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও আমলের ওপর ভিত্তি করে ইসলামী ফিকহবিদগণ সশস্ত্র জিহাদ বা কিতালের জন্য কিছু অপরিহার্য শর্ত ও মানবিক নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। নিচে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. সশস্ত্র জিহাদের পূর্বশর্তসমূহ (Prerequisites)

সশস্ত্র জিহাদকে ইসলামী আইনানুগ হতে হলে অবশ্যই নিচের শর্তগুলো পূরণ হতে হবে, অন্যথায় তা উগ্রবাদ বা ফিতনাহ হিসেবে গণ্য হবে:

- **বৈধ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ (State Authority):** সশস্ত্র জিহাদ বা যুদ্ধ ঘোষণার একক অধিকার কেবল একটি বৈধ মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের রয়েছে। কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল নিজেরা কোনো অঞ্চল বা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না।
- **আত্মরক্ষা ও আগ্রাসন প্রতিরোধ:** ইসলামে আগ বাড়িয়ে কোনো নিরীহ জাতি বা দেশের ওপর আক্রমণ করা নিষিদ্ধ। যুদ্ধ কেবল তখনই বৈধ, যখন শত্রুপক্ষ মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নেয়।
- **সামরিক ও কৌশলগত সক্ষমতা:** মুসলমানদের শত্রুর মোকাবেলা করার মতো ন্যূনতম শক্তি ও জনবল থাকতে হবে। আত্মঘাতী বা অবাস্তব কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া যাবে না।
- **চুক্তি লঙ্ঘন না করা:** যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র বা জাতির সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের শান্তি বা অনাগ্রাসন চুক্তি থাকে, তবে যেকোনো পরিস্থিতিতে সেই চুক্তি রক্ষা করতে হবে। চুক্তি বজায় থাকা অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা হারাম।

২. যুদ্ধকালীন মানবিক নীতিমালা (Rules of Engagement)

যুদ্ধের ময়দানেও যেন মানবতার কোনো অবমাননা না হয়, সেজন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) কিছু কঠোর আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (Humanitarian Laws) বেঁধে দিয়েছেন:

ক. বেসামরিক বা নিরপরাধ মানুষ হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

যুদ্ধে সরাসরি অস্ত্র হাতে অংশ নেয়নি, এমন যেকোনো সাধারণ নাগরিকের জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্পষ্ট নির্দেশ:

"তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো... তবে কোনো নবজাতক শিশু, নারী এবং অতি বৃদ্ধ মানুষকে হত্যা করো না।" — (সুনান আবু দাউদ)

খ. ধর্মীয় উপাসকদের নিরাপত্তা

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত জাতির ধর্মীয় পুরোহিত, সন্ন্যাসী বা পাদ্রী—যারা গির্জা, সিনাগগ বা মঠে উপাসনায় রত থাকে, তাদের হত্যা করা বা তাদের উপাসনালয় ভাঙচুর করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

গ. পরিবেশ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি না করা

ইসলামী যুদ্ধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রকৃতির ক্ষতি করে না। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) যুদ্ধ বাহিনীকে বিদায় দেওয়ার সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন:

- কোনো ফলবান গাছ কাটা যাবে না।
- শত্রুপক্ষের খেতের ফসল বা শস্য পুড়িয়ে ধ্বংস করা যাবে না।
- জনবসতি বা কোনো ইমারত বিনা কারণে ধ্বংস করা যাবে না।
- খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গবাদিপশু (যেমন: গরু, ছাগল, উট) জবাই করা যাবে না।

ঘ. মরদেহের অবমাননা বা 'মুসলাহ' নিষিদ্ধ

যুদ্ধে নিহত শত্রুদের লাশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। লাশের অঙ্গহানি করা (যেমন: নাক, কান কাটা), লাশ বিকৃত করা বা পুড়িয়ে ফেলা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম (সহীহ মুসলিম)।

ঙ. যুদ্ধবন্দীদের (Prisoners of War) সাথে উত্তম আচরণ

যুদ্ধবন্দীদের সাথে কোনো রকম অমানবিক আচরণ করা যাবে না। তাদের ওপর নির্যাতন করা বা তাদের ক্ষুধার্ত রাখা নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআনে বন্দীদের খাদ্য দান করাকে মুমিনদের অন্যতম গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (সূরা আদ-দাহর, আয়াত: ৮)।

৩. শান্তির প্রস্তাব এলে করণীয়

শত্রুপক্ষ যদি যুদ্ধের যেকোনো পর্যায়ে বুঝতে পারে যে তারা ভুল করেছে এবং তারা যুদ্ধ থামিয়ে সন্ধি বা শান্তি চুক্তি করতে চায়, তবে মুসলমানদের যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

"আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও শান্তির দিকে ঝুঁকুন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন।" — (সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬১)

সারসংক্ষেপ

ইসলামের সশস্ত্র জিহাদের এই শর্ত ও নীতিমালা প্রমাণ করে যে, এটি আধুনিক যুগের ‘টোটাল ওয়ার’ বা নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের যুদ্ধনীতি কেবল সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত করার অনুমতি দেয় এবং বেসামরিক জীবন, প্রকৃতি ও পরিবেশকে শতভাগ সুরক্ষা প্রদান করে। এই কঠোর নীতিমালা অনুসরণ না করে যে রক্তপাত চালানো হয়, ইসলামের পরিভাষায় তাকে জিহাদ নয়, বরং 'সন্ত্রাসবাদ' বলা হয়।

৭. জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা

সমকালীন বিশ্বে 'জিহাদ' শব্দটি ইসলামের সবচেয়ে আলোচিত কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভুল ব্যাখ্যা ও অপপ্রচারের শিকার হওয়া একটি প্রত্যয়। একদিকে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম ও ইসলামভীতি বা ইসলামোফোবিয়ায় আক্রান্ত গবেষকদের একাংশ এবং অন্যদিকে কিছু চরমপন্থী বা উগ্রবাদী গোষ্ঠী—উভয় পক্ষই শব্দটিকে তার মূল অর্থ ও কনটেক্সট থেকে দূরে সরিয়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

নিচে জিহাদ সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত প্রধান ভুল ধারণাগুলো এবং ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সেগুলোর খণ্ডন তুলে ধরা হলো:

ভুল ধারণা ১: জিহাদ = সন্ত্রাসবাদ বা পবিত্র যুদ্ধ (Holy War)

- **ভুল ধারণা:** বর্তমান বিশ্বে অনেকেই মনে করেন 'জিহাদ' মানেই হলো বোমাবাজি, নৈরাজ্য তৈরি করা, সুইসাইড অ্যাটাক এবং নির্বিচারে নিরীহ মানুষ হত্যা। পশ্চিমা পরিভাষায় একে প্রায়ই "Holy War" বা পবিত্র যুদ্ধ হিসেবে অনুবাদ করা হয়।
- **সঠিক সত্য:** প্রথমত, ইসলামে "Holy War" বা পবিত্র যুদ্ধ বলে কোনো শব্দ নেই। জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো ভালো কাজের জন্য 'সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো'। দ্বিতীয়ত, ইসলামে সন্ত্রাসবাদ (যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'হিরাবাহ' বা 'ফিসাদ ফিল আরদ' বলা হয়) এবং জিহাদ সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দুটি বিষয়।
    - **সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্য:** ভয়ভীতি, বিশৃঙ্খলা ও অন্যায়ভাবে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা।
    - **জিহাদের লক্ষ্য:** সমাজ থেকে জুলুম দূর করা, মানুষের মৌলিক অধিকার ও শান্তি ফিরিয়ে আনা।

ভুল ধারণা ২: ইসলাম জোরপূর্বক ধর্ম চাপানোর জন্য জিহাদের নির্দেশ দেয়

- **ভুল ধারণা:** একটি বড় অপপ্রচার হলো—মুসলমানরা অমুসলিমদের জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য তরবারি হাতে জিহাদ করে এবং যারা মুসলিম হতে অস্বীকার করে তাদের হত্যা করা হয়।
- **সঠিক সত্য:** এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কুরআনের স্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন:

"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই।" — (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬)

ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি কেবল তখনই দেওয়া হয়েছে যখন মুসলমানদের ওপর আক্রমণ হয়েছে কিংবা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া হয়েছে। কাউকে জোর করে মুসলিম বানানোর জন্য কোনো যুদ্ধ বা জিহাদ ইসলামে কখনো বৈধ নয়।

ভুল ধারণা ৩: যেকোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজে নিজে সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করতে পারে

- **ভুল ধারণা:** বর্তমান যুগে বিভিন্ন উগ্রপন্থী বা সন্ত্রাসী সংগঠন (যেমন: আইএসআইএস, আল-কায়েদা ইত্যাদি) কোনো একটি অঞ্চলে নিজেদের মতো দল গঠন করে স্বঘোষিতভাবে সশস্ত্র 'জিহাদ' ঘোষণা করে এবং একে বৈধ মনে করে।
- **সঠিক সত্য:** ইসলামী ফিকহ ও শরীয়তের আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি, দল বা ভূঁইফোড় সংগঠন নিজে থেকে সশস্ত্র কিতাল বা জিহাদ ঘোষণা করার কোনো অধিকার রাখে না। সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণার একক এখতিয়ার কেবল একটি বৈধ মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের (আমির)। রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ও সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব ছাড়া যে কেউ অস্ত্র হাতে তুলে নিলে তা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে 'ফিতনাহ' (বিশৃঙ্খলা) এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে গণ্য হয়।

ভুল ধারণা ৪: জিহাদ মানেই কেবল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

- **ভুল ধারণা:** অনেকে মনে করেন একজন মুসলমানের জিহাদ তখনই পূর্ণ হয় যখন সে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে অস্ত্র চালায়। অর্থাৎ, একে কেবল একটি শারীরিক ও সামরিক বিষয় হিসেবে ভাবা হয়।
- **সঠিক সত্য:** সশস্ত্র যুদ্ধ বা কিতাল হলো জিহাদের অনেকগুলো প্রকারের মধ্যে মাত্র একটি, যা কেবল বিশেষ জরুরি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে করা হয়। সাধারণ পরিস্থিতিতে একজন মুমিনের আসল জিহাদ হলো অন্য তিনটি: ১. **জিহাদ আন-নফস:**নিজের ভেতরের লোভ, হিংসা ও পাপাচারের বিরুদ্ধে প্রতিদিনের লড়াই। ২. **জিহাদ বিল ইলম:** জ্ঞান অর্জন করা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কলম ও যুক্তির মাধ্যমে লড়াই। ৩. **জিহাদ বিল মাল:** নিজের সৎ

উপার্জিত অর্থ দিয়ে সমাজ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অসহায় মানুষের দুঃখ দূর করার সংগ্রাম।

ভুল ধারণা ৫: জিহাদে বেসামরিক বা অমুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করা যায়

- **ভুল ধারণা:** চরমপন্থীরা সাধারণ অমুসলিম বা ভিন্নমতাবলম্বীদের 'কাফের' বা 'মুরতাদ' আখ্যা দিয়ে তাদের ওপর হামলা করাকে জিহাদ বলে প্রচার করে।
- **সঠিক সত্য:** ইসলাম যুদ্ধের ময়দানেও চরম মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, যুদ্ধের ময়দানেও কোনো নারী, শিশু, বৃদ্ধ, কৃষক, বেসামরিক নাগরিক এবং গির্জা বা উপাসনালয়ে রত পুরোহিতদের ওপর হাত তোলা যাবে না (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)। এমনকি ফলবান গাছ কাটা বা ফসল ধ্বংস করাও নিষিদ্ধ। সুতরাং, নিরীহ বেসামরিক মানুষকে টার্গেট করে হামলা চালানো সরাসরি ইসলামের যুদ্ধনীতির লঙ্ঘন।

সারসংক্ষেপ

জিহাদ সম্পর্কে তৈরি হওয়া এই ভুল ধারণাগুলোর প্রধান কারণ হলো ইসলামের মূল উৎস (কুরআন ও সুন্নাহ) থেকে জ্ঞান অর্জন না করে রাজনৈতিক বা পক্ষপাতদুষ্ট মিডিয়ার প্রচারণাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া। ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম এবং এর 'জিহাদ' ধারণার মূল সুর হলো মানবকল্যাণ, আত্মশুদ্ধি এবং সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

৮. আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদ

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং বিশ্বায়নের এই যুগে 'জিহাদ' শব্দটির সমকালীন বা আধুনিক প্রেক্ষাপট বোঝা অত্যন্ত জরুরি। আজ বিশ্বজুড়ে যুদ্ধবিগ্রহের চেয়েও বড় সংকট হলো নৈতিক অবক্ষয়, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, মানসিক অস্থিরতা এবং সামাজিক অসমতা। বর্তমান যুগে পারমাণবিক যুদ্ধ বা বোমাবাজির কোনো স্থান ইসলামে নেই। এই পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে জিহাদের প্রায়োগিক রূপ এবং পরিধিও পরিবর্তিত হয়েছে।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে একজন মুসলিমের জন্য জিহাদের মূল ক্ষেত্রগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনই আধুনিক যুগের জিহাদ (জিহাদ বিল ইলম)

বর্তমান যুগে যে জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে যত উন্নত, পৃথিবীতে তাদের অবস্থান তত সুদৃঢ়। ইসলামে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে জ্ঞান অর্জন করাকে অন্যতম বড় জিহাদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

- **প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার:** আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেটে ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে, তার জবাব উন্নত সাইবার জ্ঞান, তথ্য ও যুক্তি দিয়ে দেওয়া তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি বড় জিহাদ।
- **বিজ্ঞান ও গবেষণা:** চিকিৎসাবিজ্ঞান, মহাকাশ গবেষণা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় অবদান রেখে মানবজাতির কল্যাণ করা আধুনিক মুসলিম সমাজের অন্যতম প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম।

২. অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দাঁড়ানো

সমাজ বা রাষ্ট্রে চলমান বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি যেমন—দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, সুদ-ঘুষ, নারী নির্যাতন, শিশু শ্রম এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া সমকালীন প্রেক্ষাপটে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলাই হলো সর্বোত্তম জিহাদ।"* — (সুনান আবু ঃাউদ)

আধুনিক যুগে এই জিহাদ কোনো অস্ত্র দিয়ে নয়, বরং আইনি উপায়ে, সচেতনতামূলক সেমিনার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনমত গঠন এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে।

৩. সমাজ সংস্কার ও দারিদ্র্য বিমোচন (জিহাদ বিল মাল)

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করাও জিহাদের অংশ। নিজের সৎ উপার্জিত অর্থ ও শ্রম দিয়ে সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা সমাজ সংস্কারমূলক জিহাদ।

- এতিম ও বিধবাদের পুনর্বাসন, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং রক্তদান বা জনকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলাও জিহাদের আধুনিক প্রায়োগিক রূপ।

৪. ডিজিটাল মাধ্যমে দাওয়াহ ও মিডিয়ার মোকাবেলা

আজকের দিনে সবচেয়ে বড় যুদ্ধটি হচ্ছে 'মিডিয়া যুদ্ধ' বা 'ন্যারেটিভের যুদ্ধ'। বিশ্বজুড়ে ইসলাম সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা বা 'ইসলামোফোবিয়া' তৈরি করা হয়েছে, তা দূর করার জন্য আধুনিক মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করতে হবে।

- শর্ট ফিল্ম, ব্লগিং, পডকাস্ট, ইনফোগ্রাফিক্স এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত রূপ—এর শান্তি, উদারতা, সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিশ্ববাসীর কাছে সুন্দর ও আধুনিক ভাষায় পৌঁছে দেওয়া বর্তমান সময়ের দাঈদের জন্য একটি আবশ্যকীয় জিহাদ।

৫. সাইকোলজিক্যাল ক্রাইসিস ও নফসের আধুনিক জিহাদ

আধুনিক যুগের মানুষ তীব্র মানসিক চাপ, হতাশা, একাকীত্ব এবং অনৈতিক জীবনযাপনের (যেমন: পর্নোগ্রাফি আসক্তি, জুয়া, অবাধ মেলামেশা) দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

- এই চাকচিক্যময় ও বস্তুবাদী দুনিয়ার নানামুখী প্রলোভনের সামনে নিজের নৈতিকতা ধরে রাখা, মানসিক শক্তি অটুট রাখা এবং আত্মসংযম বজায় রেখে আল্লাহর বিধানের ওপর অবিচল থাকাই হলো এই যুগের সবচেয়ে কঠিন 'জিহাদ আন-নফস' বা আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদ কোনো ধ্বংসাত্মক বা উগ্রপন্থী এজেন্ডা নয়, এটি সম্পূর্ণ একটি **গঠনমূলক ও ইতিবাচক সামাজিক আন্দোলন**। আজকের যুগে একজন মুসলিমের জিহাদ হলো তার মেধা, যোগ্যতা, লেখনী ও সুন্দর চরিত্র দিয়ে নিজেকে এবং সমাজকে বদলে দেওয়া। অস্ত্র বা সহিংসতা নয়, বরং জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবিক

সেবা দিয়ে পৃথিবীর বুকে ইসলামের সুমহান সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলাই সমকালীন বিশ্বের প্রকৃত জিহাদ।

৯. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামে জিহাদ কোনো ধ্বংসাত্মক বা উগ্রপন্থী এজেন্ডা নয়, বরং এটি একটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও ইতিবাচক ধারণা। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে এবং মানব আত্মায় 'ন্যায়', 'শান্তি' এবং পরম করুণাময় আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রতিষ্ঠা করা। সমকালীন বিশ্বের অস্থিরতা দূর করতে এবং ইসলাম সম্পর্কে বিশ্ববাসীর ভুল বোঝাবুঝি অবসানের জন্য জিহাদের এই প্রকৃত, উদার ও মানবিক রূপটি তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি।

১০. রেফারেন্স

১. **আল-কুরআনুল কারীম** (সূরা তাওবাহ, সূরা ফুরকান, সূরা বাকারাহ)।
২. **সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম** (কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুল ইমারাহ)।
৩. **আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু** – ড. ওয়াহবাহ আল-জুহাইলি।
৪. **ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন আকর গ্রন্থ** (ইবনে হিশাম ও ইবনে কাসীর)।